বিহার, দলিত সমাজ ঃ বাংলা উপন্যাসে
বিভূতিভূষণ থেকে মহাশ্বেতা - প্রফুল্ল রায়

সাধন চট্টোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'আরণ্যক' লিখছেন, ভারতবর্ষ উপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে; এবং বিহারের পূর্ণিয়া, ভাগলপুর যেহেতু ভারতেরই অংশ, সেই-শাসনের চরিত্রের সঙ্গে মিশেছিল এ দেশের সামন্ত্রতন্ত্র, জাত - পাত, দারিদ্র - প্রান্তবর্গীয় জনজীবনের কথা। যদিও 'প্রান্তবর্গীয়' শব্দটির ধারণা এসেছে উত্তর - উপনিবেশিক সমাজে। 'আরণ্যক'কে অনেকেই জঙ্গল ও নিসর্গবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও চেতনার ইতিহাস - বিধৃত - আখ্যান হিসাবে মনে করেন। হয়তো, সঙ্গত কারণও আছে। তবু, এর আখ্যান কাঠামোর গভীরে ছুঁয়ে আছে ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের ইতিহাস এবং জঙ্গল ধ্বংস করে নতুন ভূমিপতিশ্রেণীর উন্মেষের কথা। দবরু পান্না এবং রাসবিহারী সিং - দুটি ধারণার দুটি জলজ্যান্ত প্রতিনিধি। বর্তমান বিহারের জাত - পাতের লড়াই ও ভূমির সংঘর্ষে রাজনৈতিক সংগ্রামের বীজ খুব ভ্রূণ অবস্থায় আমরা 'আরণ্যক' -এ পাই। ভূমিহীন ও রাঘববোয়াল ভূমিপতিদের দেখা গেছে উপন্যাসে জঙ্গল ইজারা এবং ব্যাপক উচ্ছেদ ঘটিয়ে পত্তনিপ্রক্রিয়ার মধ্যে। সরস্বতী কুন্ডি, ফুলকিয়া বইহার বা দক্রু পান্নার দেশের কথা অদ্ভুত মায়া - মমতার ভাষায় বিধৃত থাকলেও, বিহারের তৎকালীন উপনিবেশিক সমাজের ভূমি সম্পর্কের সমাজবিজ্ঞানীয় ইঙ্গিত উপন্যাসটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

আরণ্যকের সমাজ এখন বিহারে নেই। স্বাধীনতা লাভের পঞ্চাশ ষাট বছর পর রাজনৈতিক, সামাজিক, এমন কি ভৌগোলিক আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। শিল্প ও খনিসমৃদ্ধ অঞ্চল ঝাড়খন্ড রাজ্য বেরিয়ে যাবার পর, বিহার এখন মূলত কৃষি নির্ভর। হিংসা রাজনীতি, দলবাজি থেকে প্রশাসনিক অনেক কিছুর বদল ঘটলেও, সেচ - চাষ ও জমিমালিকানা সম্পর্ক বনাম জাত -পাত, জমিখোয়ানো ক্ষেতমজুর, গতরখাটিয়েদের সম্পর্কের মধ্যে আধুনিক বদলের হেরফের কিছু ঘটেনি। পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরের মধ্যে ছোট আকারের অনেকগুলি জেলা সৃষ্টি হয়েছে, যে কোনো জাতের প্রতিনিধিত্ব পতাকায় রাজনৈতিক দল তৈরি হয়েছে, তাদের প্রতিনিধি বিধায়ক - সাংসদরা এখন জাত - স্বার্থ রক্ষায় অনেক বেশি সচেতন। তবু বিহারের সমাজের মূল দুটি সমস্যা - জমি ও জাত - পাত ঃ দিনে দিনে ধারণ করছে জটিল রূপ। এমনকি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিহারের বিশেষ সামাজিক অবস্থা গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো হয়ে উঠছে নিয়ামক। সংরক্ষণ, দারিদ্রসীমা নির্ণয়, পঞ্চায়েতরাজ, অন্যান্য পিছড়েবর্গশ্রেণী ভুমি সংস্কারের দাবি ঃ নয়া উপনিবেশিক ভারতবর্ষে, বিশেষত বিহারে - খুন - জখম থেকে ধর্মান্তর, প্রাইভেট আর্মি, রাজনীতির দুর্বাত্তায়নের মধ্য দিয়ে পরস্পর বিরোধী শক্তির উত্থান আজ সমাজে ভয়ানক বাস্তব। 'আরণ্যক' -যে বৃহৎ জমির মালিকানা হিসেবে রাজপুতদের যেমন দেখেছিলাম, আজ তা ব্রাহ্মণ, কৈরি, ভূমিহারদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হয়েছে। দুসাদ, চামার, গাঙ্গোতারা 'আরণ্যক' -এ যেমন কিছুটা বোবা, নিস্পৃহ, দলিত - অত্যাচারিত কেবল, নয়া - সাম্রাজ্যবাদী সমাজে তারাও প্রতিটি জাত - পাতের পক্ষ থেকে প্রাইভেট আর্মি রাখে, মার খায় এবং মারেও। অচ্ছুৎ বা দলিত বস্তিতে আজও আগুন জ্বলে উপনিবেশিক শাসনে যেমন জ্বলত, কিন্তু পাল্টা আক্রমণের ঘটনাও বিরল নয়। গণমাধ্যমের প্রসারের ফলে সারা ভারতের মানুষ বিহার নিয়ে বেশি উৎসাহী আজ।

বাংলা উপন্যাস অতীত কাল থেকেই বিষয়ের ভুবনকে বিস্তৃত করার চেষ্টা চালিয়েছে; ফলে ভৌগলিক সীমানা তার অনেক ছড়ানো। এতে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ধারা। ইদানীং সারা ভারতবর্ষে দলিত সাহিত্যের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। বর্ণ ও জাত - পাত ভিত্তিক শোষণের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে সামাজিক আন্দোলন কিছু কিছু পরিচালিত হলেও, দলিতরা নিজেদের আন্দোলনকে নিজেরাই যখন সচেতেন ভাবে পরিচালনা করেন, তখন অভিঘাত হয় ভিন্ন। 'সংরক্ষণ ও সংস্কৃতি আমাদের মানসিক ভুবন'— ঐকতান গবেষণা পত্রের পক্ষে নীতিশ বিশ্বাসের নিবন্ধটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। ''এর বিরুদ্ধে (ব্রাহ্মণ্যবাদ বা উঁচুবর্গ) ভারতে প্রথম প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধ অনুগামীরা। আধুনিক ভারতে রামস্বামী পেরিয়ার, জ্যোতিরাও পুলে, ডাঃ আম্বেদকর এবং ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে দার্শনিক যুদ্ধের অগ্রণী বাহিনী দেশে দেশে এবং ভারতেও সাম্যবাদী শক্তি। ডঃ আম্বেদকর তাঁর জীবনের কর্মধারার প্রখর সূচনাপর্বে ১৯২৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর সাহাদের চৌদাপুকুর অভিযানের সময় দাহ করেন এই মনুস্মৃতি। শুরু করেছিলেন আমাদের রক্ত প্রবাহিত হাজার বছরের অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যে আঁধার রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত ঢুকতে দেয় না পুরীর মন্দিরে।'' সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের হাল -অর্থাৎ দলিত আন্দোলন দলিত নেতৃত্বেই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সাহিত্যের বিষয়েও, বিশেষত মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও অন্যান্য হিন্দিবলয়ে, দলিতরাই দলিতদের কথা প্রকাশ করতে কলম ধারণ করেন। নারীই যেমন নারীর বেদনা তীব্রভাবে বোঝে, দলিতসাহিত্যও নানা প্রতিভার সুযোগ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতা ছিল কিছুটা আলাদা। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে বাংলার সমাজে নানা সংস্কারধর্মী আন্দোলন চলেছিল, যা অনেকাংশেই ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরিত্রের। অবশ্য, এরও বহু আগে চৈতন্যদেব

জাতপাত বিরোধী আন্দোলনে বাংলার সমাজে এনেছিলেন বিপ্লব। তাই রামকৃষ্ণ, ব্রহ্মবান্ধব থেকে গুরু চাঁদ - আপাত আধ্যাত্মিক মোড়কে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ছিল অন্যতম লক্ষণ। সাহিত্যেও দেখি, ব্রাহ্মণ মুকুন্দরাম ফুটিয়ে তোলেন ব্রাত্য কালকেতু ও ফুল্লরার দুঃখ বেদনার কথা। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র তো আছেনই, ('শাস্তি' বা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কথা ভাবুন), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দলিত কাহারদের কথা লিখেছেন, অদ্বৈত মল্লবর্মন 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ জেলে সম্প্রদায়ের কথা তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'পদ্মানদীর মাঝি'। এ-কথা মানতেই হবে, দলিত কথা দলিতদের কলমে উঠে এলে অনেক তীব্র ও যথাযথ আসবে। কিন্তু সৃষ্টির ভুবন সবসময়ে ফর্মুলা মাফিক হয় না বলে প্রকৃত দলিত লেখা বলতে অদ্বৈত - মানিক - বিভূতি - তারাশঙ্কর বা সতীনাথকে মেনে নিতে পাঠকের অসুবিধে হয় না।

আমাদের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন বর্ণাশ্রমিক সমাজের বোঝা থেকে আমরা, এত রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্যেও মুক্ত হাতে পারিনি। কোথাও স্থূলভাবে, কোথাও অতি সূক্ষ্ম আকারে, সামন্তবাদ - উপনিবেশবাদ - মনুবাদ - এর মিশ্রণ সমাজের গভীর 'সাইকি' - তে চলমান থেকে যাচ্ছে। বর্তমানে এর সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ভূমিকা। সারাভারতব্যাপী সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের চেহারায় টের পাই, আজও এই ব্যাধি কত গভীরে আছে লুকিয়ে।

সাবআলটার্ন বা নিম্নবর্গীয় ইতিহাস - ধারণা উপনিবেশে - উত্তর চিন্তার দান। আজ পশ্চিমবাংলার বিশেষ কিছু লেখকের গল্প - উপন্যাসে নিম্নবর্গীয়দের চিন্তা - চেতনা, - অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবনার যুক্তফল হিসেবে উঠে আসছে। বিশেষত বিহার ঝাড়খন্ড উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ - যেখানে রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে সামন্ততন্ত্র গাঁটছাড়ায় বাঁধা, নানা শ্রেণীর চেতনার সংঘর্ষ সেখানে রক্তাক্ত। আজ আর, প্রেমচন্দ্রের 'সদগতি', 'কাফন' বা 'সত্তয়াসের গেঁহুর' নায়করা মুখ বুজে নীরবে প্রতিবাদ করে না; দ্রোহের ভাষা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে। তাই 'আরণ্যক' -এর গাঙ্গোতা - দুসাদশ্রেণী, সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোড়াই' রূপান্তরিত হয় মহাশ্বেতা দেবীর 'মাস্টার সাব' -এ, প্রফুল্ল রায়ের 'ধর্মান্তর' উপন্যাসের ফেকুনাথে। এ রূপান্তর শুধু এক পক্ষে হয় না, সকল শ্রেণীতেই ঘটে। তাই 'আরণ্যক' -এর রাসবিহারী সিং রূপান্তরিত হয় 'ধর্মান্তর' -এর রামধারী মিশ্রতে। শোষণের রূপক কিছুটা বদলালেও, চরিত্র একই থাকে। আর থাকে ভূমি ও সামন্তসম্পর্কের নিষ্ঠুর ও নিগূঢ় বন্ধন। এ-যাঁতাকলের বদল থেকে ঘটে না। তাই 'আরণ্যক'এ রাসবিহারী যেমন জঙ্গল পত্তনি নিয়ে হাজার একর জমির মালিক হয়ে বসে উপনিবেশিক ভারতবর্ষে, উত্তরযুগে রামধারীর মালিকানাও কিন্তু বদলায় না। প্রফুল্ল রায়ের ভাষায় বর্ণনা করলেন পাব ''তেতরিয়া থেকে সোনারি পর্যন্ত পাক্কা দুমাইল জুড়ে যাঁর অফুরন্ত শস্যক্ষেত্র তিনি কি আর বাইশ বিঘা তের কাঠা পনের ধুর জায়গার জন্য মরে যাবেন?" রবীন্দ্রনাথের বহুল প্রচলিত কবিতাটির কথা মনে পড়ে- ''শুধু বিঘে দুই, ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে, বাবু বলিলেন বুঝেছ উপেন -এ জমি লইব কিনে"।

ঐ সামান্য বাইশ বিঘা তের কাঠা ছিল মানবনিয়া গাঁয়ের চামারটোলা গৈরুনাথ চামারের। প্রতিদিন একটাকায় একটাকা সুদে, সে কিছু কর্জ করেছিল রামধারীর কাছে এবং অবশ্যই তা শুধতে না পারায়, জমিটুকু চলে যায় মিশ্রর পেটে। চিরাচরিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, গৈরু চামার হয়ে যায় ভূমিহীন কিষাণ বা খরিদী কিষাণ।

'ধর্মান্তর' উপন্যাস প্রফুল্ল রায় লিখেছেন বিংশশতাব্দীর আশির দশকে - ভারতবর্ষ তখন নয়া- উপনিবেশবাদে আক্রান্ত। অথচ, গৈরুকে প্রেমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো চরিত্রের সমান বোধ হয়। 'মহেশ' গল্পের গোফুর ছিল জোলা অর্থাৎ মুসলমান তাঁতী। কিন্তু তার জাতবৃত্তি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে গোফুর জোলা ভূমিহীন কিষাণে পরিণত। চামার গৈরুর অবস্থাও তাই। গৈরু যেন প্রেমচন্দ্রের বহুগল্পের পরিচিত চরিত্র। অথচ, প্রেমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্র উপনিবেশিক ভারতীয় সমাজের লেখক। আর বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন ভারতের সমাজে যখন প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সংস্কার বিশ্বের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, চামার গৈরুনাথ যেন ফিরে যাচ্ছে উপনিবেশিক ভারতের সামাজিক শোষণের জাঁতাকলে। তাহলে দীর্ঘ ষাট - সত্তর বছরে নিম্নবর্গ সমাজে কোনো চৈতন্যের বদল ঘটেনি? যখন গৈরুনাথ চামারের সন্তান ফেকুনাথকে দেখি - যে কিনা প্রথম ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে গাঁয়ে ফিরছে - মনে হয় 'ধর্মান্তর' বিহারের দলিত সমাজের চৈতন্য বদলের কথা বলতে চেয়েছে। তাই বিভূতিভূষণ - ফণীশ্বরনাথ - সতীনাথদের ধারা পেরিয়ে মহাশ্বেতা - প্রফুল্ল রায়দের কলমে বিহার - ঝাড়খন্ড সমাজের বদল চৈতন্যের একটি রূপরেখা আমরা পেয়ে যাই। বিশেষত নিম্নবর্গীয়দের কথা। গৈরু চামারদের চিরাচরিত ছবির পাশে ফেকুনাথকে পেয়ে যাই, যে-নাকি পিতার সমস্ত ভয়ের সংস্কারকে পেছনে ঠেলে রেখে রামধারী মিশ্রকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সফল হয় না বটে কিন্তু এ- উপন্যাসের আখ্যানে ফেলুনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আখ্যানের কথক হিসেবে তার মুখ থেকেই জানতে পারি, গৈরু চামারের জমির পরিমান ছিল বাইশ বিঘা তের কাঠা পনের ধুরু।। দৈনন্দিন একটাকায় একটাকা সুদে - যার ব্যাঙ্কিং হারের হিসাব শতকরা ৩৬৫ টাকা - ধার করে শুধতে না পারলে সে-জমি চিরদিনের মতো চলে যায় রামধারীর গর্ভে। ফেকুনাথ এই রামধারীকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, বলেছিল একটা হিসাব মেটাতে আসবে। উপন্যাসটি এই হিসাব দেওয়া নেওয়ার একটি সুখপাঠ্য আখ্যান। সুখপাঠ্য বলতে অহেতুক

সংখ্যাতত্ত্ব, রাজনৈতিক তত্ত্ব বা ব্যক্তি নিরপেক্ষ (Subjective) চিন্তায় ভারাক্রান্ত নয়।

বিহার, বিশেষত উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া - ভাগলপুর - মুঙ্গের অঞ্চল নিয়ে নিকট অতীতের মধ্যে প্রফুল্ল রায় প্রচুর লেখালেখি করেছেন। এই পটভূমিকা তাঁর সমস্ত লেখালিখির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। 'ভাতের গন্ধ', 'ধর্মান্তর', 'আকাশের নীচে মানুষ', 'দায়বদ্ধ', 'প্রস্তুতিপর্ব', 'শান্তিপর্ব', এবং আরও গল্প - নভলেটে তিনি বাংলা লেখালিখির ভুবনকে মান ও পরিমানে বিস্তৃত করেছেন। সত্তর দশক থেকেই সারা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন ভিন্ন মোড় নেয়। বিহার হয়ে পড়ে অন্যতম মুখ্য কেন্দ্র। নকশাল আন্দোলনের নামে নানা সশস্ত্র বিপ্লবী, নানান দলে, বিহারের মাটিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে এবং সামন্ততন্ত্রের জলজ্যান্ত জোয়ালকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার নামে কোমর বাঁধে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর উপন্যাস - গল্পে রাজনৈতিক সংঘর্ষের বৃত্তান্ত বেশি বেশি করে এনেছেন। শুধু পিছড়েবর্গ নয়, বিহার - ঝাড়খন্ডে বিভিন্ন আদিবাসীদের বিপুল একটি অংশের বাস। মহাশ্বেতার উপন্যাসে তাদের কথা বেশি বেশি উঠে এসেছে।

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে সামাজিক চৈতন্যের নানা খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' -এ কোনো রাজনীতি - প্রসঙ্গ ছিল না — পরাধীন উপনিবেশিক সমাজে সে - প্রসঙ্গের কোনো বাস্তবতাও ছিল অসম্পূর্ণ। সতীনাথ কিংবা ফণীশ্বরনাথের লেখাতে প্রথম রাজনৈতিক প্রসঙ্গটি উঠে এসেছিল। বিশেষত উত্তর বিহারের পিছড়েবর্গ মানুষের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব। প্রকৃতপক্ষে বিহারের লক্ষ লক্ষ নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে প্রথম গান্ধীই রাজনৈতিক জনজাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন, যা সতীনাথ বা ফণীশ্বরনাথদের দৃষ্টি এড়ায়নি। সতীনাথ তো স্যোসালিস্ট কংগ্রেসের জেলাভিত্তিক রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, নরেন্দ্রদেব, লোহিয়া, জয়প্রকাশজি প্রভৃতি। কিন্তু স্বাধীনতার পর উত্তর উপনিবেশিক পরিবেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে মিশে যায় জাতপাতের দলীয় পরিচয়। কংগ্রেস, বিজেপি, রাষ্ট্রিয় জনতা দল বা জনতা দল ইউনাইটেড হয়ে দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ভূমিহার, যাদব প্রভৃতি জাত - পাতের স্বার্থরক্ষার, এক একটি মুখপত্র। ধর্ম, জাতপাত, রাজনীতির জটিলতা বিহার - ঝাড়খন্ডের সামাজিক পরিস্থিতিকেও জটিল করে তোলে। শোষণের রূপও ক্রমশ বদলায়। সামন্ততন্ত্র ভূমিস্বার্থের মধ্য দিয়ে নানা কৌশল গ্রহণ করে। 'ধর্মান্তর উপন্যাসে প্রফুল্ল রায় নতুন এই কৌশলের প্রসঙ্গটি ইঙ্গিতবহ করে তুলেছেন।

হিন্দুধর্ম আসলে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রেরই আধিপত্যবাদ। অথচ, এ-ধর্ম ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন এবং আর্য ও আর্যপূর্ব ভারতের ভাবধারার একটি মিশ্রিত রূপ। রবীন্দ্রনাথ রামকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, বোঝা যায় যুগে যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিকৃত ইতিহাসের পথ ধরে রামকে রূপান্তরিত করেছে তুলসীদাসী পরিচয়ে এবং বিকৃততর হয়ে রাম এখন হিন্দুমৌলবাদীদের প্রতীক - চরিত্র। হিন্দুধর্মের আড়ালে আধিপত্যবাদী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রই ইতিহাসের নানা পর্যায়ে, বেদবিরোধী আখ্যা দিয়ে, নানা ধারা - উপধারাকে হিন্দুধর্মবিদ্বেষী বলে মূল ধারা থেকে বিতাড়িত করেছে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের এই ধর্মমত্ততার বিরুদ্ধে নানা সময়ে দ্রোহ - ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। আধুনিক কালে, ডঃ আম্বেদকর তাঁর অসংখ্য অনুগামীদের নিয়ে বৌদ্ধ হয়ে গেছিলেন। যেমন মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের বহু মানুষ গ্রহণ করেছিল ইসলামকে।

আধুনিক যুগের ভারতবর্ষে গত কয়েক দশক ধরে ধর্মান্তর রাজনৈতিক রূপ পেয়ে যাচ্ছে। প্রফুল্ল রায়ের এই আখ্যানটিতে ধর্মান্তরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপটি খুবই স্বচ্ছ ভাবে ফুটেছে।

রাজনৈতিকভাবে ধর্মান্তরকে ইস্যু করে কট্টরপন্থী হিন্দুসংগঠন পুনরায় নিম্নবর্গীয়দের বাবা-বাছা করে, কখনো চোখরাঙানি, অথা সশস্ত্রভাবে (স্টেইন হত্যার প্রসঙ্গ মনে আসে) পুনরায় গণ-ধর্মান্তিকরণে ফিরিয়ে আনছে নিম্নবর্গীয়দের। আর কট্টরপন্থী ধর্মসংগঠনগুলো গ্রামে গ্রামে পেয়ে যাচ্ছে সামন্ত্রতন্ত্রের সহযোগিতা। 'ধর্মান্তর' উপন্যাসে অর্থনীতি - রাজনীতির টানাপোড়েনে ধর্মান্তকরণের চেহারাটি লেখক ভারি সুন্দর ফুটিয়েছেন। যে চামার, দুসাদটোলার মানুষ ভূমিমালিকদের কাছে শুধুই ক্ষেতমজুর, গতরখাটিয়ে - রাণীক্ষেতের সন্ন্যাসীদের নিয়ে রামধারী বা শিউশঙ্কররা নিখরচায় ভোজের ব্যবস্থা করছে। তখন 'অচ্ছুৎ' -মনোভাব ভুলে পংক্তিভোজনেও তাদের আপত্তি থাকে না। যদিও গোপন ও কৃত্রিম আড়ালটুকু আখ্যানে অলিখিত নেই। তখন সমস্ত অচ্ছুৎ-চামার-দুসাদরা নাকি বৃহৎ হিন্দুসমাজেরই! খৃষ্টান বা মুসলমান হয়ে যাবার বিরুদ্ধে ভূমিমালিকদের কী আকুল চেষ্টা! কারণ, আন্তর্জাতিক ধর্মের আশ্রয়ে ভাতুয়া কিষাণ বা ক্ষেতমজুরদের কিছুটা বড় শক্তির সাহায্য মিলে যেতে পারে, যা রামধারীদের সামাজিক অবস্থানের স্থিতাবস্থা ক্ষুন্ন করে দেবে।

ফেকুনাথ এ-উপন্যাসের ইতিবাচক চরিত্র। চামারটোলার প্রথম ম্যাট্রিক পাশ ছোকরা। এতে সাধারণ মানুষের কাছে তার মর্যাদা কিছুটা বাড়লেও, সামন্ত্রতন্ত্রের কাছে তার পরিচয় 'গৈরু' চামারিয়াকা 'বেটা', সমস্ত উপন্যাসে এই পরিচয়টুকুই তাকে বহন করতে হয়েছে। ম্যাট্রিক পাশ দিয়েছে, এটা বাস্তব। তা এড়ায় কি করে? তাই বিশ্লেষণে সামান্য রদবদল ঘটেছে মাত্র। 'গৈরু চামারিয়াকা ম্যাট্রিক পাশ ছোয়া'। যখনই ফেকুনাথ জমিদারবাড়ি গেছে, দারোয়ান থেকে মুন্সি— সবাই তাকে সম্বোধন করেছে এভাবেই। সে যে চামার বংশের, তা ভুলতে দেয়নি। এমনকি রামধারী মিশ্রের নিজের ব্যাটা যখন ফেল মারছে, তখনও ক্ষোভ ব্যঙ্গ বিদ্রুপের বান বইতে হচ্ছে ফেকুনাথকেই।

বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন রক্তাক্ত ও সংঘর্ষপূর্ণ। উচ্চবর্ণের প্রাইভেট আর্মি নিম্নবর্গের মোকাবিলা

করছে যেমন গুলি - রাইফেল দিয়ে, চামার দুসাদ গাঙ্গোতারাও প্রতি আক্রমণে পেছপা নয়। মহাশ্বেতা দেবী এই রক্তাক্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাহিত্যে সরাসরি তুলে এনেছেন। প্রফুল্ল রায় সামাজিকভাবে চৈতন্যের রূপান্তর দেখাচ্ছেন ব্যক্তি - বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। তাই আখ্যানের শেষে গৈরু চামার, ফেকুনাথকে থামে বেঁধে জুতো পেটানো সহ্য করতে না পেরে, দা নিয়ে ছুটে আসে। 'রুখ যাও, রুখ যাও, দুখনের (ফেকুনাথ) গায়ে আরেকবার হাত ওঠালে জানে খতম করে দেব। হোঁশিয়ার - হোঁশিয়ার - হোঁশিয়ার', বলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সামনে ছুটে যায়। আখ্যানের শুরুতে আমরা কোন্ গৈরুনাথকে পেয়েছিলাম ? ছেলে ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে ফিরে আসার পর, মালিকের বাড়িতে উভয়ে যায় কৃতজ্ঞতা জানাতে। ''উচ্চবর্ণের বড়ে সরকারের, পা ছোঁওয়ার অধিকার বা সাহস কোনোটাই নেই গৈরুনাথের চোখের কোণ দিয়ে ফেকুনাথকে প্রণাম করার ইশারা করে রামধারীর উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা ঠেকায় সে। দেখাদেখি নিঃশব্দে তাই করে ফেকুনাথ। কিন্তু তার মুখচোখ কেমন যেন কঠিন দেখায়। মাটি থেকে মাথা তুলে হাতজোড় করে থাকে গৈরুনাথ। বলে, 'হো গিয়া হুজৌর'।''

'লিখিপড়ি লেড়কা-কো বাপ বন গিয়া', বলে চোখ কুঁচকে তাকান রামধারী। এরও আগে আখ্যানে লেখক সরাসরিই পাঠকদের ধরিয়ে দিচ্ছেন- ''গৈরুনাথ এত গরিব এবং দুর্বল যে কারুর মুখের ওপর 'না' বলতে পারে না। যে যা বলে মুখ বুজে সায় দিয়ে যায়। বিশেষ করে রামধারী মিশ্র কিছু বললে তো কথাই নেই। দুবেজি জানেন, এর একমাত্র কারণ গৈরুনাথের আজন্ম ভীরুতা। এই পৃথিবীতে সবাইকে ভয় পায় সে। তবে সব চাইতে বেশি ভয় তার রামধারীকে। মারাত্মক, সীমাহীন ভয়। রামধারী কিছু বললে, তা অমান্য করার মতো দুর্জয় সাহস তার নেই।''

এই গৈরুকে আমরা 'আরণ্যকে' পেয়েছিলাম। ভারতবর্ষ তখন উপনিবেশিক রাষ্ট্র। 'আরণ্যকে'র স্থানও প্রায় এক ছিল। কিন্তু 'ধর্মান্তরে' গৈরুনাথ আখ্যানের শেষে মুখর হয়েছে, ধারণ করেছে অস্ত্র। চৈতন্যের এই পর্বান্তর ঘটেছে নয়া-উপনিবেশবাদের ভারতবর্ষে, ঐ 'আরণ্যক' -এর স্থানেই। শুধু কাল বদলেছে। কাল বদলেছে সামাজিক ইতিহাসকে, বিহারের পটভূমিকায় ধারণ করেছে বাংলা উপন্যাস। প্রকৃতিও বদলেছে। 'আরণ্যক' -এর চোখ ও মনভোলানো জঙ্গল আর নেই, হারিয়ে গেছে সরস্বতী কুন্ডি - যেখানে গভীররাতের জ্যোৎস্নায় নির্জনে পরীরা নামত। এখন অচ্ছুৎ চামার - দোসাদরা প্রকৃতির সামনে নিরুপায়। তাইতো শীত বা গ্রীষ্মে বিহারে সাধারণ মানুষদের কয়েকশো পথেঘাটে মরে পড়ে থাকে। ''অঘুন বা অঘ্রাণ মাস শেষ হয়ে এসেছে। এর মধ্যেই মাঠে মাঠে ধানকাটা শুরু হয়ে গেছে। হিমালয় বেশি দূরে নয়। উত্তর দিক থেকে যে উল্টোপাল্টা হাওয়া বইছে তা যেন সারা গায়ে বরফ মেখে আসছে। সে হাওয়া হাড়ের ভেতর পর্যন্ত বিঁধে যায়। এখন সকাল। দিগন্তের তলায় সোনার প্রকান্ড কটোরার মতো সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে। যে রোদটুকু উঠেছে উত্তুরে বাতাসকে তাতিয়ে উষ্ণ, আরামদায়ক করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। চারপাশের চাপ চাপ কুয়াশা এখনও ভালো করে কাটতে শুরু করেনি। রাস্তায় ধারে গাছের পাতায় বা ধানের শিষে শিশির হীরের দানা হয়ে আছে।'' এই প্রতিকূল পরিবেশে গৈরু চামারের পোষাক কী ধরনের ? লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন, 'অঘ্রাণের হিমবাহী বাতাস ঠেকাতে ধুতি - ফতুয়ার ওপর রোঁয়াওলা ধুসো কম্বল। এবড়ো খেবড়ো লোহার পাতের মতো পা দুটো একেবারেই খালি। মাথায় পাগড়ির মতো করে গামছা জড়ানো। এবাবে যতটা হিম ঠেকানো যায়।'' উত্তর বিহারের ঠিক এই আবহাওয়ার সকালে রামধারীকেও দেখাচ্ছেন লেখক। ''তাঁর পরনে ফিনফিনে ধুতি, সার্জের পাঞ্জাবি এবং আরামদায়ক দামি বালাপোষ। ইজিচেয়ারের তলায় শুঁড়তোলা ধবধবে নাগরা । নাগালের মধ্যেই ছোট কাশ্মীরি টেবিলে রূপোর রেকাভি ভর্তি পেস্তা বাদাম কিসমিস আকরোট সাজানো রয়েছে। ফরশি টানা স্থগিত রেখে মাঝে মাঝে একমুঠো করে বাদাম পেস্তা মুখে পুরে আস্তে আস্তে চিবিয়ে যাচ্ছেন।''

অসীম ফারাকের দুই বিরোধী শ্রেণী অবস্থান বিহারের সমাজে, যেখানে গণতন্ত্র, আইন - আদালত প্রতিষ্ঠানগুলো নামকেওয়াস্তে। লেখক নিজেই বলেছেন আখ্যানে, ''স্বাধীন ভারতবর্ষের যেদিকে ভারতীয় সংবিধান, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টের কানুন চালা আছে, তার বাইরে বিহারের এইসব অঞ্চল।'' এটা উপনিবেশিক সমাজেরও চিত্র ছিল। কিন্তু নয়া - উপনিবেশবাদ ও স্বাধীনোত্তর কালে যুক্ত হয়েছে, ''ফিউডাল সিস্টেমের সঙ্গে তুখোড় শয়তানি আর জাতপাতের গোঁড়ামি মিশিয়ে নিজস্ব স্টাইলে এখানে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন রামধারী মিশ্র।'' নিজস্ব স্টাইল বলতে ফিউডালইজম -এর সঙ্গে ধর্ম ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের গাঁটছড়া বন্ধনের নয়া মাত্রা।

দলিতদের কথা দলিতরা লিখলে, অনেক বেশি তীব্রতা লাভ করে বলেই ভারতবর্ষে দলিত সাহিত্যের উত্থান। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কিছু লেখক এর ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমী ধারাটি আজও চলমান। বিভূতিভূষণ থেকে মহাশ্বেতা - প্রফুল্ল রায়দের কলমে বারে বারে উঠে আসছে বিহারের পটভূমি এবং দলিতদের কথা। তাঁদের চৈতন্যবদলের সামাজিক রূপ। সাহিত্য নিছক যে নন্দনতত্ত্ব নয় - রাজনীতি, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের গবেষণাগার - উক্ত লেখকরা তা প্রমাণ করে চলেছেন। আনন্দের কথা, ঝাড়খন্ড, বিহার বা মধ্যপ্রদেশের প্রবাসী বঙ্গভাষার নতুন প্রজন্মের লেখকরাও নিজেদের কলমকে চৈতন্যবদলের সামাজিক রূপ থেকে সরিয়ে রাখছেন না। বাংলা উপন্যাসে বিহারের দলিত সমাজ একটি নতুন ভুবন গড়ে তুলছে।